রঞ্জন ঘোষাল

আস্তাবলের গান : একটি অনির্দিষ্ট অ্যালবাম্

'মহীনের ঘোড়াগুলি' এখন আমার কাছে স্মৃতি-সম্মোহে দুরন্ত হয়ে থাকা ছুটন্ত জানালার একটা দুরপাল্লার ট্রেন।

সত্তরের গোড়ার দিকের কথা। নক্‌শাল আন্দোলনকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে মধ্যবিত্ত ও মধ্যস্বত্বভোগী বাঙালি, পুলিশ, সি.আর.পি, কংগ্রেসী আর অর্ধসিদ্ধ কমিউনিস্টরা।

সেই থম্‌ধরা সময়ের পরবর্তীকালীন কিছু ছবি।

মহীনের ঘোড়াগুলির জন্মেরও আগের ঘটনা। মণিদা জেল থেকে বেরিয়ে তখন জব্বলপুরে। কিংবা ভোপালে।

আমি যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। মণিদার পরের ভাই বুলা, মানে প্রদীপ, যেহেতু আমার আপন মামাতো দাদা এরা, ফলে বুলা নয়, বুলাদা। বুলাদার সঙ্গে ছিল আমার গলায় গলায়। বুলাদা বি-ই কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে সুললিত বেকার জীবন কাটাচ্ছে।

আমাদের একটু দূর সম্পর্কের আর এক মামাতো দাদা, ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায় তখন যাদবপুরেই মেক্যানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ লেকচারার। এমনিতে লেকচারারের সঙ্গে ছাত্রদের কফি হাউসে বসে হা-হা হিহি করার কথা নয়। কিন্তু সে আর শুনছে কে? ধূর্জটিদার প্রথম (এবং একমাত্র) কাব্যগ্রন্থ, 'কেন জলশব্দে প্ররোচিত হলে মালবিকা' তখন ছেপে বেরিয়ে গেছে। কবি ও পাঠক মহলে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল সেই কবিতাগুচ্ছ। সেই ধূর্জটিদা আর বুলাদার সঙ্গে যাদবপুর কফি হাউসে তখন আমার নিরন্তর আড্ডা। মাঝে মাঝে ট্রেনে করে বেরিয়ে পরা। হোটর স্টেশনে নেমে একটা সরু খালে শালতিতে চড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা, গভীর রাতে শ্মশান-ভ্রমণ, সবই ঘটত। অনেক সময়েই সঙ্গে থাকতো একটা বাঁশি বা গিটার, পদ্য লেখার খাতা আর একটা ট্যাম্বুরিন।

(এর কিছু আগে, ১৯৬৯ নাগাদ, বিশুর বয়স্কাউটের জাম্বুরিতে গিয়ে এব্রাহামের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। দুজন টীন-এজ সাংগীতিক ছেলের মধ্যে সাঙ্ঘাতিক বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে

সময় লাগেনি। জাম্বুরি থেকে ফেরার পর এব্রাহাম বিশুদের পঞ্চাননতলার বাড়িতে এসে মণিদাকে প্রথম দেখে। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের সেখানেই সূত্রপাত। তখনো মণিদা জেলে যায় নি। বাপি আর ভানু দুজনেই বেহালার ছেলে, বীটল্‌স্‌ ভালোবাসে, মণিদার কাছে আসছে। গিটার বাজিয়ে গান গাওয়া শিখছে। এরাই ভবিষ্যতে বিধুর বিহঙ্গের গান গাইবে।)

মণিদার নেতৃত্বে এই বুলা, বিশু (মণিদার সব চেয়ে ছোটো ভাই), এব্রাহাম, বাপি, ভানু আর আমি এই সাতজন 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র প্রথম অফিসিয়াল ঘোড়া হিসেবে চিহ্নিত হলাম। (ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল আরও অন্ততঃ দু ডজন ঘোড়া, যাদের উৎসাহ ও শ্রম ছাড়া এই ব্যান্ড নির্মাণ সম্ভব হত না। কিন্তু তাদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অন্য সময়ে হবে।)

আজ কিছু ছিন্ন স্মৃতি-কুসুম।

এক.

ধূর্জটিদা আর আমি, হোটর স্টেশনের সামনে দিয়ে যে খালপথটা বেরিয়ে গেছে অনন্তের দিকে, সেই জলপথে ঘটত আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা। হঠাৎ আবিষ্কার, তারপর বহুবার গেছি ওই পথে। সেই খালের দু'ধার দিয়ে ঝুঁকে পড়েছে প্রাচীন বৃক্ষরাজি আর বাঁশবন। দিন মানেও তখন সেই নাব্য খালটিতে ঝুঁঝকো আঁধার, যা কোনমতেই পার্থিব নয়। সেই খালপথে শাল্‌তিতে বসে জলশব্দে প্ররোচিত হচ্ছি আর গানের কথা লিখছি আমি আর ধূর্জটিদা, মিলিত প্রয়াসে। বুলাদা গীটারে সুর বানাচ্ছে।

এই ভাবে গড়ে উঠল 'প্রি-মহীনের ঘোড়াগুলি'র একটি দুরপনেয় গান ঃ

হয় যদি হোক, নামটি তাহার আল্লা বা গড-ই।
একটি গানে আমরা তাকে ভুলতে রেডি
আমরা ট্রায়ো, তিনজন
ধূর্জটি-বুলা-রঞ্জন
ডু রু রু ডু, ডু রু রু ডু, ডু রু রু ডু রু ডি
এক সহস্র ফুলের মাঝে একটি মেলডি।

এক কাপ কফি, পাঁচ পয়সায় একটি সিগারেট
মহিলাদের বুক ভাঙি না, বুক করি না ডেট —
একটা গানের বদলে
সব কিছু যাই ভুলে
ডু রু রু ডু, ডু রু রু ডু, ডু রু রু ডু রু ডি
রাজার শূন্য সিংহাসনে একটি মেলডি।

হ্যাভারস্যাকে শান্তি রাখি, দুঃখ পেছনে
কিট ব্যাগেতে ভালোবাসা, ছুটি আপট্রেনে।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সোনাটা
সুরের স্বপ্নের সোনাটা
ডু রু রু ডু, ডু রু রু ডু, ডু রু রু ডু রু ডি
মেলার ভিড়ে চম্‌কে দিয়ে যাই একটি মেলডি।

গানটা গাইতে গাইতেই আমরা আবার উঠে পড়েছি সাবারবান্ ট্রেনে। যাদবপুর স্টেশনে নেমে অল্প হেঁটেই কফি হাউস। সেখানে বসে নিচু চাপা গলায় চলল সুরের মাজাঘষা, একটা দুটো শব্দর অদল-বদল। গানটা দাঁড়িয়ে গেল।

এর ঠিক পাঁচ মাসের মাথায়, ধূর্জটিদা তখন 'বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে' পড়াচ্ছে, প্রেম উথালপাথাল, কাব্য-জ্বরের বেভুল। ধূর্জটিদা আত্মহত্যা করে। সেটা ছিল ১৯৭৩ সাল। আমাদের জীবনকে চমকে দিয়ে চলে গেল ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায়।

এখনো কষ্ট পাই।

আর একটা কষ্টও পাওনা ছিল। ২০০৩ সালে, মানে মাত্র তিরিশ বছর পরে আমরা কয়েকজন মিলে হোটর স্টেশনে গিয়ে নামি। দেখি খালটা অদৃশ্য। ওখানকার জনতা, সকলেই সদ্য যুবক ও কিশোর-কিশোরী — তারা জানেই না ওখানে ছিল একটি স্রোতস্বিনী, বহতা জলপথ। সেখানে শাল্‌তিতে চেপে পাঁচ-সাত মাইল দূরের গ্রামে গঞ্জে চলে যাওয়া যেত। এই তো, মাত্র সেদিন। কী হঠাৎ করে হারিয়ে গেল একটা জলজ্যান্ত নদী?

এবং ঠিক কী করে চলে গেল একটি আদ্যন্ত রোম্যান্টিক মানুষ—ধূর্জটি?

দুই

সালটা ১৯৭৭। নির্ণীয়মান 'মহীনের ঘোড়াগুলি'।

রবীন্দ্রসদনে কন্‌সার্ট। সারাদিন ধরে স্টেজ সাজাচ্ছি। স্টেজের পরিকল্পনাটি অযান্ত্রিক। বাঁশ আর দড়িদড়া দিয়ে তৈরি ভারা। মাচানের স্টেজ। শর্মিষ্ঠা আর সঙ্গীতা সামুদ্রিক ঘোড়ার বড়ো বড়ো কাট আউট তৈরি করে যাচ্ছে। বেহালার পঞ্চাননতলা আর চৌরাস্তার একদল যুবক হরিশ মুখার্জি রোডে, চেতলায়, কালীঘাটে চোঙা ফুঁকে এসেছে এক রাউন্ড। 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র মোহিনী গান। শুনতে আসুন রবীন্দ্রসদনে, আজ সন্ধ্যে সাতটায়। ঠিক সাতটায়। এই গান শুনলে বাতব্যাধি সারে, মামলায় জিত হয়, ফেল করা ছেলে পরীক্ষায় পাশ হয়, ব্যবসাতে দেখা যায় লাভের মুখ, ফুটবলে জয়লাভ। 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র গান। নিজে শুনুন অন্যদের শোনান। টিকিট আর বেশি পড়ে নেই কিন্তু।" আবার বেরোবে ওরা। মহীনের ব্যাকবোন। খাওয়া-দাওয়াও হয়নি কারো। ব্রেগাঞ্জা থেকে পিয়ানোটা এসে পৌঁছনোর কথা, এখনো আসে নি, গুব্‌গুবির জবাটা পাওয়া যাচ্ছে না, অডিয়েন্স হবে তো? হল ভরবে কি? শর্মিষ্ঠা ও সঙ্গীতা, চিত্রাংশু থেকে যথাক্রমে বুলাদা ও আমি। মণিদার মেজাজ তুঙ্গে। আমরা তেড়ে বকুনি খাচ্ছি আসতে যেতে। তারই মধ্যে মেয়ে দুটি মাথা ঠাণ্ডা রেখে কীভাবে কাজ করে যাচ্ছে জানি না। অবশ্য বকুনি কিন্তু ওরা এক্কেবারেই খাচ্ছে না। ওরা দুটোতে আসলে

মন্ত্র জানে। মণিদাকে কীভাবে যেন বশ করে ফেলেছে ওরা। গত কয়েক রাত ধরেই, নিজেদের বাড়িতে বসে গাদা গুচ্ছের পোস্টার হাতে এঁকে, লিখে তৈরি করে এনেছে শর্মিষ্ঠা আর সংগীতা। আর আমাদের বেহালার বন্ধুরা সেগুলো শহরময় সাঁটতে বেরিয়ে পড়েছে। (প্রসঙ্গত বলা দরকার, আজকাল মহীন নিয়ে প্রচুর হৈ চৈ হচ্ছে, বই বেরুচ্ছে, সিনেমা বানানো হচ্ছে কিন্তু মহীনের ইতিহাসে অনেকেই অকীর্তিত থেকে গেছে। নেপথ্যের নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে কথা বলার সময় এসেছে।)

কিন্তু না, আজ সে গল্প নয়। অন্য একটা ছোট্ট গল্প এখন। তো সেই কনসার্টের দিন, তখন বিরতির সময়, আমরা পরের গানগুলোর জন্য রেডি হচ্ছি, মণিদার হাতের গীটারের তার ছিঁড়ে গেছে, সেটা পরানো হচ্ছে। মামীমা এক্তা, আদা, মিছরির পাঁচন বানিয়ে দিয়ে দিতেন, সেটা একটা ফ্লাস্কে থাকত। যারা গাইবে, তাদের গলাটা বশে রাখার জন্য ঐ গরম পাঁচন ছিল অব্যর্থ। কে যেন ফ্লাস্কের ঢাকনাটা খুলে রেখে স্টেজে ঢুকে গিয়েছিল, পাঁচন জুড়িয়ে জল। ভানু আদা-চা চাই বলে অস্থির, সময় আর দশ মিনিট হাতে, এমন সময়ে একজন কাঁচুমাচু মুখ, মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এসেছেন, ব্যাকস্টেজে দেখা করতে চাইছেন। বলছেন অনেক দূর থেকে এসেছি, একটু কথা বলতাম। আপনারা নিজেরা গান বেঁধে গাইছেন কিনা, খুব ভালো লাগছে। আমি নিজেও একটু আধটু লিখি, সুর দিই, শুনবেন?

কিন্তু না, আমরা কী করে শুনবো? আমাদের হাতে তো একদম সময় নেই। কী ঝকমারি রে বাবা। ভদ্রলোক করুণ মুখ করে চলে যাচ্ছেন। মণিদা ওঁকে ডাকলেন, আচ্ছা, শুনিয়ে যান।

মফঃস্বল থেকে আসা লোক, বগলে ছাতাটাতাও ছিল বোধ হয়। মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে গেলেন। দু লাইন গাইলেন নিজের লেখা গান। এখনো সুরটা কানে লেগে আছে। গানের কথা গেঁথে গেছে মনের মধ্যে —

কলকলিয়ে বৃষ্টি ঝরে, জ্যোছনা ফোটে অল্প
কুড়িয়ে পাওয়া নাকছাবিটি বাঘের চোখের গল্প।
হারিয়ে গেছে পাতালটি
ভাসছে আলোয় চাতালটি —
দুপুর রাতে ভুল বকছে চন্দ্রাহত মাতালটি।

চমকে গিয়েছিলাম আমরা সবাই। কী অসাধারণ শ্রাব্যকাব্য। গাইবার ঢংটিও সোজাসাপটা। সোজা এফ শার্পে ধরলেন, যেমন বাউলরা ধরেন। আমাদের আত্মার আত্মীয় যেন লোকটি।

ততক্ষণে স্টেজে ঢোকার ঘন্টা বেজে গেছে।

শো-এর পরে আর ওঁকে দেখি নি। হয়তো ট্রেন ধরবার তাড়া ছিল, চলে গেছেন। কিন্তু কোথায়? কোথায় হারিয়ে গেলেন উনি? ওঁর সঙ্গে আর দেখা হয় নি কোনোদিন।

কী ভাবছেন? কী লিখছেন উনি? বেঁচে আছেন তো?

খোঁজ চাই।

রাজাদের খিদিরপুরের বাড়িতে রিহার্সাল বসেছে। শুক্কুরবার। পরের দিন স্টার থিয়েটারে শো আছে। তাই যন্ত্রগুলোর সঙ্গে সড়গড় হয়ে নেওয়া জরুরি। পিয়ানো আছে রাজাদের বাড়িতে। নইলে, কনসার্টের জন্য তো নিতেই হয় ভাড়া, একদিনের বদলে দুদিনের জন্য ব্রেগাঞ্জা থেকে পিয়ানো এনে নাকতলার বাড়িতেই রিহার্সাল করা যেত। কিন্তু পিয়ানোর ভাড়ার চেয়ে আনা-নেওয়ার খরচটাই বিশাল। একটা আপরাইট পিয়ানো আনতেই দশজন লোক লাগে, তা পিয়ানো হলো আলফনসো আমের চেয়েও বেশি আলাতুনে। একটু ঝাঁকুনিতেই টস্‌কে যায়, টিউনিং যায় ছারেখারে। তাই বারবার আনা নেওয়া করাটা বহুৎ ঝঞ্ঝাটের। ঠিক হয়েছে রাজাদের বাড়িতেই মহড়া বসবে দুদিন। সবাইকে বলা হয়েছে সময়মত হাজির হতে। সব বাদ্যভান্ড নিয়ে বসা হচ্ছে কিনা। যারা স্টেজে উঠছে না তাদের জন্যও বহু কাজ। মহীনের সাতজন ঘোড়াই কি সব নাকি? ছিল আরও জনা পনেরো, যারা নিরলসভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে গেছে।

আমি আর বুলা-দা পৌঁছেছি দেরিতে। দেরির কারণ দুজনেরই এক। বুলাদা ছিল শর্মিষ্ঠার অপেক্ষায় থিয়েটার রোডের অরবিন্দ ভবনে। বিড়াল তপস্বী। হাতে ঘড়ি পরার অভ্যেস নেই, আবার শর্মিষ্ঠার সঙ্গে এপয়েন্টমেন্টের ঠিক করার ব্যাপারটাও ছিল বিচিত্র। "তাহলে ইয়ে, মানে দুপুর নাগাদ থিয়েটার রোডের দিকটাতেই দেখা হোক কাল পরশু।" এবং শর্মিষ্ঠার জবাব, 'হ্যাঁ, মোটামুটি সেই রকমই ঠিক রইল"! মনে রাখতে হবে এসব আজকালকার মোবাইল জমানার কথা নয়, সুতরাং দুপুর মানে যে ঠিক কখন এবং থিয়েটার রোডের দিকটা মানে যে প্রিসাইজলি কোন স্পট সে সব উহ্য রাখার ফলে অশেষ তিতিক্ষায় বুলাদা অরবিন্দ ভবনে কখনো ধ্যানে বসত, কখনো ওখান থেকে হেঁটে শর্মিষ্ঠার গভমেন্ট আর্ট কলেজের সামনে পর্যন্ত একটা চক্কর দিয়ে এসে আবার অরবিন্দ ভবনের মেঝেয় পদ্মাসনে বসে চক্ষু মিটমিট।

আর আমার ছিল উলটো। কখন কোথায় রিঙ্কু (সঙ্গীতা) দাঁড়াবে তার নির্ঘন্ট আগেভাগে স্থির করে রাখা থাকত। আর কোনো রকমে রিঙ্কুর দেরি হলেই শুরু হয়ে যেত আমার রে রে কাণ্ড। আমি নিজে দেরি করতাম না কখনোই। এ নিয়ে লম্বা লেকচারও ঝেড়েছি কাউকে কাউকে বহুবার।

সেই আমি রিহার্সালে লেটে পৌঁছচ্ছি। মণিদার হাতে তুলোধোনা তো হবোই। নিজের কাছেও এই বিলম্বোদ্গামন শ্লাঘাসূচক নয়। বাসস্টপে নেমে দেখি, অন্য একটা মিনিবাস থেকে বুলা-দা নামছে, অপ্রস্তুত, কিন্তু আমাকে দেখে খানিকটা ভরসা পাওয়ার দোনামোনা হাসি নিয়ে। বুলাদা বলল, আমরা প্রায় পৌনে একঘন্টা লেট, না? আমি বললাম, "আজ কদমতলা রুটে বাস চলছে না, তাই বেলিলিয়াস রোড দিয়ে সঙ্গীতাকে বাড়ি যেতে হচ্ছিল। এরিয়াটা ভালো নয়, তাই আমি পুরোটাই এগিয়ে দিয়ে এলাম, একেবারে ওদের বাড়ির গেট অবধি। তারপর ফেরার সময়ে দেখি বেলিলিয়াসের রুটও বন্ধ। খুব ঝকমারি গেছে।

কিন্তু মণিদা তো আর সে সব শুনবে না।

রাজাদের বাড়িটা বড়ো। কিন্তু বাইরে থেকেও, কান পাততে হচ্ছে না, এমনিতেই শোনা

যাচ্ছে কণ্ঠে যন্ত্রে জমকালো মহড়ার বজ্রনির্ঘোষ। আমরাই শুধু নেই। চেলো শুনছি, বিশুর ঢাউস কন্ট্রাবেসের গুরুগম্ভীর আওয়াজ পাচ্ছি। মণিদার ইলেক্ট্রিক গিটার, বাপি, ভানু আর মণিদার গলা। পবন (পবন দাস বাউল)-ও আছে বোধ হয়। নইলে গুবগুবিটা বাজাচ্ছে কে? প্রণবের ড্রাম্‌স ক্ষ্যাপার মত বাজছে। রাজার হাতে বোধ হয় আমার ট্যাম্বুরিনটা। কেন রে বাবা, বেশ তো রিদম গীটার বাজাচ্ছিলি। যেই দেখেছিস আমি নেই, অমনি আমার ট্যাম্বুরিনখানা ... আরে বাবা আমি তো খালি ওটাই বাজাতে পারি।

সবাই আছে, শুধু আমরাই নেই। বুলাদার শার্টের মধ্যে গোঁজা আছে বাঁশিটি। প্রায় সব কটা গানেই বাঁশি বাজবে। বুলা-দার কপালে দুঃখ আছে অনেক।

এই কন্‌সার্টে পিয়ানো, ড্রাম্‌স ছাড়াও থাকছে দোতারা, গুব্‌গুবি আরও কতো কী। তপিকে দেখেছিলাম কালকে শহরের বাইরে কোথাও বেরিয়ে যেতে। কীসের খোঁজে কে জানে।

রাজাদের বাড়ির সদর দরজাটা খোলাই আছে। একটি বিহারী দারোয়ান আছে বটে কিন্তু সে আমাদের চেনে, বারবার বলছে চলিয়ে যান না। উপরে উঠিয়ে যান। কিন্তু আমাদের কি প্রাণের ভয় নেই।

এমন সময়ে হঠাৎ একজন ঢাকী একখানা বিশাল ঢাক কাঁধে এসে আমাদেরই জিজ্ঞেস করে বসল, ব্যানার্জিদের বাড়িটা কোনটা বলতে পারেন?

আমি বললাম, কে পাঠিয়েছে আপনাকে? লোকটি বলল, কাল তপিবাবু এসেছিলেন, বললেন গানের সঙ্গে বাজাতে ...।

আমি ওকে আর বাক্য সমাপ্ত করতে দিতে পারলাম না। ঢাকখানা ওর কাঁধ থেকে খুলে নিজের কাঁধে, আর তারপর ভারিক্কি চালে ওপরে উঠে গেলাম, যেখানে চলছে তুমুল রিহার্সাল। আমাকে ঢাক কাঁধে ঢুকতে দেখে থেমে গেল গান। আমার পিছু পিছু বুলাদা, হাতে বাঁশি, যেন এতক্ষণ রেওয়াজে মত্ত থাকার জন্যই সময় বেভুল হয়ে গেছে, আমার ভাবখানা যেন ঢাকীর আশাতেই এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। মণিদা আমাকে ধমকাতে গিয়েও হেসে ফেলল। বলল, ঢাক নিয়ে ঢোকা? শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাস্? আমাকে ঢাকাই বাঙাল পেয়েছিস? মণিদার ছুঁড়ে মারা দেশলাই বাক্সটা লক্ষ্যভ্রস্ট হল। না হলেও ক্ষতি ছিল না। ততক্ষণে ঢাকীর আপ্যায়নে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ও আবার তপির মামাবাড়ির গ্রামের লোক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল ঢাক আর ড্রাম্‌সের যুগলবন্দী। দোতারায় গিটারে, চেলো ভিয়োলা ভায়োলিনে সমবেত গান, সময় অসময়ের গান, মানুষের ভালোবাসাবাসির গান। জলাকীর্ণ বানভাসির ডুকরানো পুকার। যে সঙ্গীতের কুহকে গন্ধর্বরা নন্দিন হত, কিন্নরকুল তিন সপ্তকে রণিত হয়ে ওঠেন, পামরের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়, সুধীজন প্লুত হয়ে ওঠেন, সেই অমরাবতীর গান। যা আমরা ছুঁতে চেয়েছিলাম।

আমরা হয়তো পারি নি। কিন্তু আমাদের সময়ের পরেও মহীনের আরো অনেক ঘোড়া জন্ম নিয়ে চলেছে। একদিন তারা ঠিক পারবে। দেখে নিও।